প্রচলিত বিভিন্ন খতম তাৎপর্য ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অজুহাত ও তার পর্যালোচনা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

অজুহাত ও তার পর্যালোচনা

একটি দো'আ বা আরবী বাক্যকে দুরূদ বলতে উচিত ছিল এটা জানা যে, এই দুরূদটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন কি না, জীবনে কোনো সাহাবীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কি না, অথবা কোনো সাহাবা দুরূদ হিসেবে এই বাক্যগুলো পড়তেন কি না তা দেখা। বিপদে আপদে তারা কোনোদিন এই দো'আকে আমলে এনেছেন কি না লক্ষ্য করা। কোনো সাহাবা থেকে বিশুদ্ধ সুত্রে এই দুরূদ পেলে আমরা ধারণা করে নিতাম, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এটি শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে, সাহাবায়ে কেরাম ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজ থেকে কিছু বলেন না। এর কোনোটি না পেলে এই দো'আ বর্জনের জন্য আমাদের অন্য কিছু দরকার পড়ে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর পড়ার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন দুরূদ ফযিলত সহ বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো দুরূদগুলো কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? মূলত যিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের শিক্ষাকে যথেষ্ট মনে করেন তার জন্য আর অন্য দুরূদের প্রয়োজন নেই। অন্য দুরূদ জায়েয করতে তার মাথা ঘামাবার সময় নেই। তার কথা হবে, আমার নবী করেননি, নবীর হাতেগড়া ছাত্ররা করেননি, আমি তা করব না। কিন্তু হুবহু সুন্নাতের উপর থাকার আসলাফের সেই জযবা আমাদের থেকে হারিয়ে যাওয়ার কারণে ইবাদতগত বা বিশ্বাসগত নতুন কিছু আসলেও আমাদেরকে জায়েয না-জায়েযের বাহাসে লিপ্ত হতে হয়। আবু হানিফা রাহ. এর অনুসারী দাবী করলেও হানিফী মানসিকতা হারিয়ে যাওয়ার কারণে নতুন আলোচনার প্রয়াস পায়। বিভিন্ন ওজুহাতে আমরা নব উদ্ভাবিত আমলকে জায়েয করার চেষ্টা করি। খতমে না-রীও এর বিপরীত নয়।

বিভিন্ন সময় এই দো'আটির আপত্তিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলে যে অজুহাতগুলো পেশ করতে দেখা গেছে শুধু সেগুলো নিয়ে একটু পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর তওফিক কাম্য।

প্রথমেই যে অজুহাত পেশ করা হয় তা হলো, আমরা রাসূলকে কেবল মাধ্যম মনে করি মাত্র। এখানে শির্কের কোনো প্রশ্নই আসে না। মাধ্যমে মনে করলেই শির্ক হতে পারে না একথা কতটুকু শুদ্ধ, তা আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি। আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যে, মাধ্যম মূলতই শির্ক অথবা শির্কের পথ। কেননা কারো সমস্যা সমাধান করতে, দুঃখ দুর্দশা দূর করতে, প্রয়োজন মিটাতে, বৃষ্টি দিতে আল্লাহ কোনো মিডিয়ার মুখাপেক্ষী নন। এবার আমাদের দো'আটির বিষয়ে আসা যাক। মোটকথা কর্মের যোগসূত্র যার সাথেই রয়েছে সেটিই মাধ্যম, যে কোনোভাবে এই যোগসূত্র থাকুক না কেন। যার সাথে কোনো যোগসূত্র নেই তাকে মাধ্যম বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, আপনি একটি অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কোনো ব্যক্তি আপনাকে তাঁর হাত দ্বারা টান দিয়ে রক্ষা করেছে। আপনি বলতে পারেন, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আবার এও বলতে পারেন যে, অমুক ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছে। এ দ্বিতীয় বাক্যটির ক্ষেত্রে মুমিন ব্যক্তির বিশ্বাস হলো, মূলত আল্লাহই আমাকে রক্ষা করেছেন, অমুক ব্যক্তি মাধ্যম মাত্র। এখানে লোকটি বলতে পারে, আল্লাহর দ্বারা রক্ষা পেয়েছি। আবার এও বলতে পারে যে, অমুকের মাধ্যমে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। এখানে তার কোনো

কথাই শির্ক হবে না। কিন্তু লোকটি যদি বলে, রাসূল আমাকে রক্ষা করেছেন, অথবা রাসূলের মাধ্যমে আমি রক্ষা পেয়েছি, তবে তার উভয় কথাই শির্ক হবে। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কোনো আলেম এতে সংশয় বা দ্বিমত পোষণ করবেন না। এই একটি বিষয়ে রাসূলের মাধ্যম শির্ক হলে আপনার জীবনের যাবতীয় বিষয়ের মাধ্যম রাসূলকে বানিয়ে দিলে তা শির্ক হয় না এ কেমন কথা? এবার আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণের কাছে বিনীত আবেদন যে, আপনারা একটু চিন্তা করলেই সমাজ ধীরে ধীরে শির্কমুক্ত হতে থাকবে। তাই চলে আসা প্রথাকে জায়েয বানাবার চেষ্টা না করে সমাজকে শির্কমুক্ত করার দিকে একটু মনোনিবেশ করুন।

জনৈক বিজ্ঞ আলেমের সাথে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি আমাকে বালাগাতের কিতাবে উল্লেখিত উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি শির্ক নয় বলে বুঝাবার চেষ্টা করেন। পরে আরো অনেককে এই উপমা পেশ করতে দেখেছি।

উপমাটি হচ্ছে, ‘‘أنبت الربيع البقل’’ অর্থাৎ বসন্ত শষ্য উৎপাদন করেছে। তারা বলে থাকেন, মুমিন ব্যক্তি এই বাক্যটি বললে শির্ক হয় না, কারণ সে এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করে। মুমিনের বিশ্বাস মূল শষ্য দাতা আল্লাহ। বসন্তে তা উৎপাদিত হয়। তাই সে বলে, বসন্ত শষ্য উৎপাদন করেছে।

বস্তুত তাদের এ কথাটি অগ্রহণযোগ্য আর এ ধরনের উপমাও আল্লাহর সাথে অসামঞ্জশীল। কারণ কোনো কাজকে কার্যকারনের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে কিংবা সাহাবায়ে কিরাম থেকে কোনো হাদীস বা আছার পাওয়া যায় না। বরং এর বিপরীতটিই পাওয়া যায়, দেখুন সাহাবায়ে কিরাম বলেন,

«لولا الكلب لجاءنا اللص»

‘যদি কুকুর না থাকত তবে চোর আসত’ এ জাতীয় কথাকে শির্কে (আসগর) এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই ‘‘أنبت الربيع البقل’’ অর্থাৎ ‘বসন্ত শষ্য উৎপাদন করেছে’ এটা কোনোভাবেই কোনো মুমিনের কথা হতে পারে না। কারণ মুমিন জেনে বুঝে শির্কে আসগরে লিপ্ত হতে পারে না।

এখন বলতে পারেন তাহলে এ কথাটি কোত্থেকে আসল? বস্তুত তা জানার জন্য আমাদেরকে তথাকথিত বালাগত বিদ্যার প্রবর্তকদের মন-মানষিকতা, আকীদা মাযহাব দেখতে হবে। তাদের অনেকেই মু'তাযিলা, আশ'আরিয়্যা ও মাতুরিদিয়া মাযহাবের লোক থাকার কারণে তাদের গ্রন্থে সেটার অনুরনন দেখতে পাওয়া যায়। তারা মাজায বা রূপক বলে অনেক শির্ককে বালাগাত বানালেও সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ জাতীয় কথাকে কখনও স্বীকৃতি দেন না। তাই এ জাতীয় কথা কোনো মুমিন বলতে পারে না।

এ তো গেল বাস্তব কার্যকারণের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলার মাসআলা। বাস্তব কার্যকারণের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে কোনো কথা বলা যদি শির্কে আসগার হয়, তবে যেখানে বাস্তব কোনো কার্যকারণ নেই সেখানে সেদিকে সম্পর্কযুক্ত করা নিঃসন্দেহে শির্কে আকবারে পরিণত হবে। যেমন, কেউ যদি বলে ‘‘রাসূল শষ্য উৎপাদন করেছেন বা রাসূল ধান দেন’’ অথবা ‘‘রাসূলের মাধ্যমে শষ্য উৎপাদন হয় বা রাসূলের মাধ্যমে ধান হয়’’ এর কোনটি বলার কোনো সুযোগ নেই, কারণ তা শির্কে আকবার হবে। আশা করি, আশেকে রাসূল নামে রাসূলকে আল্লাহর সাথে বিভিন্ন গুণাবলীতে সমতুল্যকারী ছাড়া সবাই এ ধরণের কথাটির মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারলেন। এবার আপনি নিজেই খতমে না-রীর ব্যাপারে ফায়সালা দিন।

এখন উপরোক্ত অজুহাতটির অসারতা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি। তবে এই অজুহাতটি যারা ব্যাকরণ বা ভাষার জ্ঞান রাখেন তারা পেশ করেন। আর যাদের ব্যাকরণের গভীরতা নেই তাদের সামনে এই অভিযোগ তুলে ধরলে তারা প্রথমে অন্য অজুহাত পেশ করেন। সেটি না টিকলে পরবর্তীতে আবার ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলেন। প্রশ্ন হলো, প্রথমে যখন নিজে শির্ক মেনে নিয়ে অন্য অজুহাত দেখালেন তবে সেই অজুহাত না টিকলে আবার পূর্ব কথাকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে টিকানোর চেষ্টার কী প্রয়োজন।

অন্য অজুহাতের মধ্যে যেমন, একদিন জনৈক আলেমের সাথে আলোচনা করলে তিনি বলেন এখানে, “به” শব্দের “ه” সর্বনামটি “صلاة” শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত। অতএব রাসূলের ওসিলায় নয় বরং এই দুরুদের ওসিলায়। কিন্তু তিনি এটি লক্ষ্য করেননি যে, “ صلاة ” শব্দের দিকে সর্বনাম প্রত্যাবর্তিত হলে এখানে পুংলিঙ্গের সর্বনাম “ه” ব্যবহার না হয়ে স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম “ها” হত।

আরেকদিন এ বিষয়ে এক সেমিনারে আলোচনায় এখানে সর্বনাম ‘সালাত’ শব্দের দিকে নেয়ার সুযোগ নেই বললে একজন বলে উঠলেন “صلاة” শব্দটি মাসদার। আর আরবী ব্যকরণ অনুযায়ী মাসদারের দিকে যে কোনো সর্বনাম ব্যবহার করা যায়, কেননা মাসদার পুংলিঙ্গও নয় আবার স্ত্রীলিঙ্গও নয়। একথা শুনে অত্যন্ত অবাক লাগল। নিজের মতকে অটুট রাখতে কোনদিকে খেয়াল না করে যারা কথা বলেন, তাদের কথায় যেমন হাসি পায় তেমনি তারা এ ধরণের কথা বলে নিজের আস্থা নষ্ট করেন। আরবী ভাষায় উনার জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে প্রশ্ন এসে যায়। কেননা, প্রথমত: এখানে “صلاة” স্ত্রীলিঙ্গ ধরেই “كاملة” শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: “محمد” শব্দের পরেই “الذي” ইসমে মাউসুল নিয়ে আসা হয়েছে। জানা কথা ইসমে মাউসুলের পরে বাক্য থাকা এবং তার মধ্যে একটি সর্বনাম থাকা জরুরী যা মাউসুলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং এখানে “ه” কে “الذي” এর দিকে না নিয়ে অন্য দিকে নেয়ার কথা বলা কতটুকু গাফলতির পরিচয় একটু ভেবে দেখুন। তৃতীয়ত: দো‘আটির শেষদিকে রয়েছে “بوجهه” তার চেহারা বা তার স্বত্বার মাধ্যমে। অতএব সর্বনামকে মুহাম্মদ ছাড়া অন্যদিকে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সুযোগ থাকাবস্থায় বক্তার কথা থেকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ নেওয়াকে আরবী প্রবচনে বলা হয়, “توجيه القول بما لا يرضى به القائل” অর্থাৎ বক্তার কথার এমন ব্যাখ্যা দেওয়া যা বক্তার নিজের উদ্দেশ্য নয়। আর যেখানে কোনো সুযোগ নেই সেখানে এমনটি নেওয়া কতটুকু অবান্তর ও হঠকারিতা একটু ভেবে দেখেছি কি?

এবার ধরে নিন কেউ উপরোক্ত দুরূদটিকে সমান্য পরিবর্তন করে সর্বনামগুলো দুরুদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে নতুন একটি দুরূদ বানাল। যার মর্ম হল যেমন, “যে দুরুদের মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান হয় .....”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা বা বলে দেওয়া ছাড়া কারো এধরণের কোনো কথা বলে বৈধ কি? বিভিন্ন দুরূদ এবং তাতে কী লাভ, কী ফযিলত, কী উপকার সবই আমাদের নবী আমাদেরকে বলে গেছেন। ওহি ছাড়া এর বাইরে কিছু বলা বৈধ কি? ওহির বিষয়ে ওহি ছাড়া যুক্তি দিয়ে কিছু বলার নামইতো ভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। মানুষের জ্ঞান যেখানে শেষ সেখান থেকে ওহীর সুচনা। ওহীর বিষয়ে যুক্তি দিয়ে বলার কারণেই বিভিন্ন বাতিল দল উপদলের জন্ম। এসব জানা থাকা সত্বেও ওহির মুখাপেক্ষী বিষয়ে আমরা কী-ভাবে দখল দিতে পারি। এটি কি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর মিথ্যাচার নয়?

আরেকটি অজুহাত কেউ কেউ পেশ করেন যে, আমাদের বিশ্বাস তো সবকিছু আল্লাহ করেন। রাসূল করেন বা মাধ্যম হন বলে আমাদের আক্বীদা নয়। তবে এটি শির্ক কী-ভাবে হয়? আর বেশিরভাগ লোক অর্থ না জেনেই

পড়েন। আলহামদুলিল্লাহ, এই বিশ্বাস বলেইতো এই দুরূদ পড়লেই আপনাকে কাফের বা মুশরিক বলা হচ্ছে না। আপনার বিশ্বাস এই দুরুদের মর্মানূযায়ী হলে তো আপনি মুশরিক হয়ে যেতেন। বলা হচ্ছে এখানে শির্কী কথাবার্তা রয়েছে। শিরকী আক্বীদা পোষণ ছাড়া শির্কী কথাবার্তা বলার হুকুম কী প্রশ্নটি আপনাদের কাছে রেখেই ইতি টানছি।

পরিশেষে আরেকটি কথা এই যে, অনেককেই বলতে শুনা যায়, খতমের বিপক্ষে এ সব কথা বলে আমাদের পেটে লাথি মারবেন না। আফসোস!! আপনি জাতির একজন কর্ণধার। আপনার মুখ থেকে এমন কথা বের হলে ঘুষখোর, সুদখোরের সামনে ঘুষ সুদের বয়ান করলে সে যখন বলে উঠে হুজুর, আমাদের পেটে লাথি মারবেন না। তার কথায় আর আপনার কথায় বেশ কম কী? সবার রিযকের মালিক আল্লাহ। যে ব্যক্তি যে পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য সেই পথকেই সহজ করে দেন বলে আপনার আমার পূর্ণ বিশ্বাস। হালালের উপর থাকতে বদ্ধপরিকর হলে আল্লাহ আপনার আমার রিযকের ব্যবস্থা হালালের মধ্যে থেকেই করবেন বলে আমরা পূর্ণ আস্থাশীল ইনশা আল্লাহ। এর বিপরীত বিশ্বাসের পরিণাম কী তা আপনার আমার সবারই নিশ্চয় জানা আছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝা এবং হালালের উপর থাকার তওফিক দান করুন। আমীন।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11080

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন